aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator



স্বাধীনতা দিবস

## গণতন্ত্রের পথযাত্রায় প্রতিবন্ধক

২০০৮-০৩-২৬ : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মার্কিনি যুদ্ধবাজদের গগনবিদারী প্রচারে আস্থা রাখলে অবশ্যই বলতে হবে যে গণতন্ত্রের এখন রমরমা অবস্থা; সে ভীষণ বেগে ধাবমান, যেখানে গণতন্ত্র নেই সেখানেই গিয়ে হানা দিচ্ছে, নিজেকে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করছে। চলে গেছে সে ইরাকে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে, চীনে গণতন্ত্র কতটা আছে সে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, হস্তক্ষেপ করছে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও। লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন, গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তবে ছাড়বে, তার আগে নয়।

কিন্তু যেসব জায়গায় গণতন্ত্র গিয়ে হানা দিচ্ছে সেখানকার অবস্থাটা কী? ইরাকে কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, পঙ্গু হয়েছে অনেকে, দেশছাড়া হয়েছে তার চেয়েও বেশি। একত্রে ছিল যে মানুষেরা তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে, দেশটি যে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে এটা কষ্টকল্পনার বিষয় নয়, বাস্তবিক সত্য বটে। আফগানিস্তান বিধ্বস্ত এবং যে তালেবানদের একদা অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও সমাজতন্ত্র বিরোধিতার উত্তেজক আদর্শবাদ নিয়মিত সরবরাহ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে চলেছে; মারা পড়েছে এবং এখনো পড়ছে অসহায় জনগণ। পাকিস্তানও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মার্কিনি তৎপরতার দরুন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ যেখানেই গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের ওপর হস্তক্ষেপ সেখানেই বিপদ।

তাই প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র জিনিসটা আসলেই কী? তার যে এত জয়ধ্বনি তা কোন্ কারণে? আমেরিকায় যে গণতন্ত্র দেখা যাচ্ছে তাকে গণতন্ত্র বললে দুর্বিপাক বলে চিহ্নিত করা যাবে কাকে? এই গণতন্ত্র বিশ্বের জন্য আগ্রাসী শক্তি। উপকার করার আড়ম্বরপূর্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করে সে দেশ-বিদেশের সম্পদ, বিশেষ করে খনিজ তেল অপহরণ করে, সমরাস্ত্র বিক্রির প্রয়োজনে যুদ্ধ বাধায়, নিজেদের আজ্ঞাবহ তাঁবেদার লোকজনকে ক্ষমতায় রাখার জন্য অতিউলঙ্গরূপে হস্তক্ষেপ চালায়। নিজেদের দেশের ভেতরে নানা অছিলা ও অজুহাতে নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত করে। নির্বাচিত সরকারকেই এরা গণতান্ত্রিক সরকার বলে এবং দেশের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে রেখে নিম্নসংস্কৃতির লোকজনকে নির্বাচিত করে আনে। নির্বাচনে কারচুপি, মামলা-মোকদ্দমা সবকিছুই চলে। বৃহৎ কোম্পানিগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী দু'পক্ষকেই প্রচুর পরিমাণে টাকা দেয়, কেননা যে-ই জিতুক সে-ই তাদের লোক। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ দেখায় নির্বাচিতরা কোনো প্রকার কার্পণ্য করে না। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রীরা দেশের ভেতরে ফ্যাসিবাদী, বাইরে সাম্রাজ্যবাদী। এই গণতন্ত্র মানুষকে চায় না, ক্ষমতা চায়। মুনাফার জন্য কাতর থাকে এবং ধ্বংসকাণ্ডে মোটেই ইতস্তত করে না।

গণতন্ত্রকেই তো আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে জানি ও মানি। কিন্তু সেটা কোন্ গণতন্ত্র? অবশ্যই পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নয়। সেই যে বলা হয়েছে, গণতন্ত্র হচ্ছে সেই ধরনের সরকার যা জনগণের যেটি পরিচালিত হয় জনগণের স্বার্থে এবং জনগণের দ্বারা, সেই ব্যবস্থাটা এমনকি একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝানোর জন্যও যথেষ্ট নয়, গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। জনগণই সরকার চালাবে এটা আশা হিসাবে অত্যন্ত ন্যায্য। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠা যে কত দুরূহ সেটা অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে। জনগণ যে তার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তার উপায়টা কী? উপায় হচ্ছে ভোট। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য ভোট অপরিহার্য। কিন্তু কথা হলো, কে কাকে ভোট দেবে? ভোটে প্রার্থী হবে টাকাওয়ালারা, ভোট দেবে সাধারণ মানুষ; যার অর্থ হলো দু'জন টাকাওয়ালার (দু'জনের বেশি হলেও অসুবিধা নেই, ব্যাপার ওই একই) মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া। আর ওই টাকাওয়ালারা যে মুহূর্তে নির্বাচিত হবে সেই মুহূর্তেই তারা অংশ হয়ে যাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার, যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী। কেবল অংশ হবে না, রাষ্ট্রের সেবক হবে এবং যে পরিমাণে সেবা করতে পারবে ততটাই সাফল্য লাভ করবে।

আমাদের দেশে বড় বড় মানুষদের প্রায়ই উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনি যে নির্বাচনকে তারা কালো টাকামুক্ত না করে ছাড়বেন না। কিন্তু সবকিছু যেখানে টাকায় চলে, যে সমাজে মানুষের বদলে টাকাই সমস্ত কিছু ঠিক করে দেয়, টাকাই শাসক—সেখানে কোন্ টাকাটা কালো আর কোন্টা সাদা, সেটা ঠিক করবেন কী করে? টাকার স্তূপ গড়ে যেখানে উঠেছে বুঝতে হবে সেখানে লুণ্ঠন রয়েছে। লুণ্ঠনের বৈধ নাম হচ্ছে মুনাফা এবং যত লুণ্ঠন ততই প্রতারণা ও বঞ্চনা, এটাই তো নিয়ম। নির্বাচনে যে টাকা খরচ হয় তার প্রায় সবটাই কালো টাকা, সে টাকাকে সাদা করার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন। টাকাওয়ালারাই নির্বাচিত হবে এবং নির্বাচিত হয়ে তাদের টাকার পরিমাণকে আরো বাড়াবে; এই খেলা কোনো একটি দেশ বলে নয়, পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্রই চলছে এবং চলতে থাকবে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ভুল সমস্যাটা তাই অন্যকিছুর নয়, বৈষম্যের বটে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গেলে তাই জনগণের কথা আসবে। কিন্তু একথা বলাটা মোটেই যথেষ্ট হবে না যে, গণতন্ত্রের অর্থ হলো নির্বাচিত সরকার, বলতে হবে যে গণতন্ত্র চায় নাগরিকদের (অর্থাৎ জনগণের) মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। সব মানুষ সবদিক দিয়ে সমান মেধা ও যোগ্যতার হবে না নিশ্চয়ই, ব্যবধান থাকবে; কিন্তু সবার জন্যই থাকবে সমান সুযোগ ও অধিকার। যে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা অনেক কঠিন, মুখে মুখে উচ্চারণ করার তুলনায় তো অবশ্যই, এমনকি সংবিধানে স্পষ্টাক্ষরে লিখে রাখার তুলনাতেও। অধিকার ও সুযোগের সাম্যে পুঁজিবাদ মোটেই বিশ্বাস করে না, পুঁজিবাদের চিন্তাধারাটা হলো এই রকমের যে, সে-ই টিকবে যার যোগ্যতা আছে। এটা আদিম জোর যার মুলুক তার-এর বন্য রীতিরই নতুন সুসজ্জিত ও ভদ্র সংস্করণ। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তাই মোটেই গণতন্ত্র নয়। উল্টো বরঞ্চ বলা যায়, এ হচ্ছে গণতন্ত্রের শত্রুপক্ষ। কেননা পুঁজিবাদ বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং একই সঙ্গে বৈষম্যের লালন-পালনের দায়িত্বও নিয়ে নেয়। গণতন্ত্রের পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধক রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই অন্তরায়ের সৃষ্টি করে; কিন্তু সবচেয়ে উঁচু ও কঠিন প্রতিবন্ধক হলো বৈষম্য। অন্যগুলো ডিঙিয়ে এলেও এটির কাছে এসে ধাক্কা খেতে হয়।

বৈষম্য রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করার কাজে যেমন মস্তবড় অন্তরায় তৈরি করে, তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতিতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেয়। আমরা সেই সমাজকেই গণতান্ত্রিক বলব, যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কটা উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের নয়; বরঞ্চ মৈত্রীর, সহযোগিতার ও সহমর্মিতার। মানুষ

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator



স্বাধীনতা দিবস

গণতন্ত্রের পথযাত্রায় প্রতিবন্ধক

হচ্ছে সামাজিক প্রাণী; সামাজিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, তার বুদ্ধিবৃত্তি, সৃষ্টিশীলতা, নৈতিকতা সবকিছুই বিঘ্নিত হয়। এমন উক্তি শোনা যায় যে, আগে গণতন্ত্র দরকার পরিবারে, রাজনৈতিক দলের ভেতরে, সব রকমের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে, তাহলেই না আমরা গণতন্ত্র আশা করতে পারি সমাজ ও রাষ্ট্রে। এই উক্তিতে মনে হবে যুক্তি আছে; কিন্তু আসলে এতে সত্য নেই, আগে বিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্র আসবে, তারপর সেই গণতন্ত্র চলে যাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে, এটা হচ্ছে খালের সাহায্যে নদী তৈরির দুরাশা। এভাবে তো গণতন্ত্র আসবে না; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে রাষ্ট্রে ও সমাজে, তাহলে সে নদী থেকে অন্যত্র গণতন্ত্রের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে বলে আমরা আশা করতে পারব। তাই বলে এটাও অবশ্য সম্ভব নয় যে, সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো গণতন্ত্র শূন্য অবস্থায় থাকবে। অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

এখানেই সংস্কৃতির প্রশ্নটা আসে। কেন্দ্র, পরিধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছুর সত্তাটাকে ধারণ করে রাখে সংস্কৃতি। মূল্যবোধ, বিনোদন, সভ্যতা, সামাজিক আদান-প্রদান সবকিছু মিলেই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে গণতান্ত্রিকরূপে দেখতে চাই বলে আমরা যখন ইচ্ছা প্রকাশ করি, তখন বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে বলি না, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অত্যাবশ্যকীয়, আমরা বলি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। সংস্কৃতি তখনই গণতান্ত্রিক হয়, যখন তার অন্তর্গত আদর্শবাদটা থাকে বৈষম্যবিরোধী।

মোট কথাটা হলো এই যে, গণতন্ত্র ও বৈষম্যের পক্ষে একসঙ্গে থাকাটা অসম্ভব। বৈষম্য যেখানে বিদ্যমান, বুঝতে হবে সেখানে গণতন্ত্র নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পুঁজিবাদের পথ ধরল, তখন সেখানে বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করল এবং বোঝা গেল গণতন্ত্রের চলার পথ বিঘ্নিত হতে যাচ্ছে; যদিও পুঁজিবাদী বিশ্ব প্রচণ্ড নিনাদে এমনটা প্রচার করতে থাকল যে, সেখানে স্বৈরাচারের অবসান ঘটেছে এবং জরুরি ভিত্তিতে গণতন্ত্রের চাষাবাদ অত্যাসন্ন বটে। তখন সেখানে নারী ও বয়স্কদের নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বর্ণবৈষম্য বৃদ্ধির ঘটনাই বলে দিচ্ছে যে, সেখানে আর যা-ই হোক, যথার্থ গণতন্ত্র আসবে এমন উপায়ও আর নেই। চীনও পুঁজিবাদের পথ ধরেছে, সেখানেও গণতন্ত্র বিপন্ন হতে বাধ্য। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সে প্রসঙ্গে বোধকরি যোগ করা সঙ্গত যে, গণতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে বিশ্বাস করে না, গণতন্ত্র চায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন।

সভ্যতার অগ্রগতিতে পুঁজিবাদের অবদান সামান্য নয়। চিকিৎসা, যোগাযোগ, নানাবিধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, বিনোদনে বৈচিত্র্য সাধন ইত্যাদিতে পুঁজিবাদের ইতিবাচক কাজে মানুষ উপকৃত হয়েছে। কিন্তু এই পুঁজিবাদই এখন অনাহার, বেকারত্ব, যুদ্ধ, জলবায়ুতে পরিবর্তন, এমনকি জীবনযাত্রার উৎকর্ষে অবনতি সাধন ইত্যাদি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত রয়েছে। মানুষকে সে মুনাফালোভী, ভোগবাদী, পরস্পরবিচ্ছিন্ন এমনকি আত্মবিচ্ছিন্ন অসামাজিক প্রাণীতে পরিণত করবে বলে অবিরাম হুমকি দিয়ে চলেছে। এমন আচরণ নিয়ে গণতন্ত্রের সে মিত্রপক্ষ হবে এটা কেমন করে সম্ভব?

২

তা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাটা কী রকমের? ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশে গণতন্ত্র আসবে এটা ছিল অসম্ভব, কেননা দেশ ছিল পরাধীন, পরাধীনরা আবার গণতান্ত্রিক শাসন পাবে কী করে? তারপর পাকিস্তান এলো, কিন্তু গণতন্ত্র এলো কি? এলো না। না আসার কারণ হচ্ছে বৈষম্য। ব্রিটিশের রাষ্ট্রেও বৈষম্য ছিল মস্তবড় সত্য। এমনকি ভোটের অধিকারও সবার ছিল না। সেটা সীমিত ছিল শতকরা ১১-১২ জনের ভেতর। পাকিস্তানেও সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একবারই, ১৯৭০ সালে, যে নির্বাচন দুই পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান যে ভেঙেছে তা আঞ্চলিক দূরত্বের কারণে নয়, আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণেই। পূর্ব পাকিস্তানেই তখন বেশিরভাগ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করতো, হিসাবটা ছিল এখানে শতকরা ৫৬ জন, ওখানে ৪৪ জন; সুযোগ-সুবিধা ওখানকার ৪৪ জনই অধিক পরিমাণে পেতো, এখানকার মানুষেরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করতো; এর মধ্যে আবার সংখ্যাসাম্যের এক অত্যাশ্চর্য নিয়ম কায়েম করে দুই পাকিস্তানকে ভোটাধিকারের ব্যাপারে সমান করার চেষ্টা হয়েছিল, অর্থাৎ ৫৬ জনকে দাবিয়ে দিয়ে ৪৪ জনের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এতে সাম্য আসবে কী, বরঞ্চ বৈষম্যই বেড়েছে। অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রশাসনের স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিকতা সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়েছিল, এমনকি ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বৈষম্যমূলক অগণতান্ত্রিকতা মানেনি, তারা স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছে।

তারপর স্বাধীনতা এলো। যুদ্ধ করে তাকে আনতে হলো। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্র এলো কি? না, আসেনি। না আসার কারণ সেই পুরনো ঘটনা; বৈষম্য। ব্রিটিশের রাজত্বে শাসক ও শাসকের মধ্যে যে বৈষম্যের কারণে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো উপায়ই খোলা ছিল না, পাকিস্তান আমলেও সেই একই বৈষম্য গণতন্ত্রের যাত্রাপথকে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছিল। বাংলাদেশ এলো, আমরা কেবল স্বাধীন নই, মুক্তই হয়ে গেছি বলে অনুমান করলাম, আশা করা গেলো যে বহুকাল ধরে আমরা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য লড়াই করছিলাম, এবার সেই রাষ্ট্র ও সমাজকে পেয়ে যাবো।

কিন্তু পাইনি যে তার প্রমাণ ও লক্ষণ তো যেখানে-সেখানে। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম যে নির্বাচন হলো, সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলো না। তারপর এলো একদলীয় শাসন। পরবর্তী সময়ে একের পর এক সামরিক শাসনের পালা। এরপর একাধিক নির্বাচন এসেছে। কিন্তু হায়, গণতন্ত্র আসেনি। প্রধান কারণ সেই পুঁজিবাদী বৈষম্য। নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে ধনী ব্যক্তিরা, যারা এদেশে একটি শাসকশ্রেণী গড়ে তুলেছে। ওই শাসকশ্রেণীর ভেতর দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার যে নৃশংস প্রতিযোগিতা, সেটাই হলো বাংলাদেশের রাজনীতির মূলধারা। এই শ্রেণীর সদস্যরা নিজেদের এই দল ওই দলে ভাগ করে নির্বাচনে দাঁড়ায়, নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে খাড়া করে। পরে আবার সেটির সমালোচনা শুরু করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাস থাকার কথা, এবার তারা নিজেরাই ঘোষণা দিয়েছে যে অন্তত দু'বছর থাকবে। নির্বাচন কবে হবে বোঝা

aspbd.com
your application
service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator



স্বাধীনতা দিবস

গণতন্ত্রের পথযাত্রায় প্রতিবন্ধক

যাচ্ছে না, হলেও তার মধ্য দিয়ে যে জনগণের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এমন আশা দুরাশা বৈকি! আর জনগণই যদি ভালো না থেকে খারাপ থাকে, তাহলে গণতন্ত্রের প্রমাণ কী? গণতন্ত্র তো চাই জনগণের মঙ্গলের জন্যই। রাষ্ট্র ব্রিটিশ আমলে যেমন আমলাতান্ত্রিক ছিল, এখনো তেমনই রয়ে গেছে। শাসন করে অসামরিক ও সামরিক আমলারাই। এরা নির্বাচিত নয়, এদের নেই জবাবদিহিতার দায়, চরিত্রগতভাবেই এরা অগণতান্ত্রিক।
তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎটা কোথায়? গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে কী করে? প্রতিষ্ঠা করার পথ একটাই, সেটা হচ্ছে আন্দোলন। এই আন্দোলনকে অবশ্যই হতে হবে বৈষম্যবিরোধী। যার নির্গলিতার্থ হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধিতা। পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের রক্ষক হওয়ার ভান করে, কিন্তু ওই ছদ্মবেশীই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তাই পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম বটে। পুঁজিবাদকে মানবিক চেহারা দেওয়ার পরিকল্পনার বিষয়ে আমরা অবহিত; কিন্তু তার চেহারার ওপর যতই কারুকার্য করা হোক না কেন, তাতে ভেতরের স্বভাবের তো কোনো ইতরবিশেষ ঘটবে না। দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পুরবেন বলে কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়, আসলে দারিদ্র্যকে নয়—জাদুঘরে রাখতে হবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদকে। গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন আর পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন এক ও অভিন্ন। সে আন্দোলন দরকার যেমন স্থানীয়ভাবে, তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও। পুঁজিবাদকে তার ইচ্ছামাফিক কাজ করতে দিয়ে গণতন্ত্রের পথকে বাধামুক্ত করা যাবে এমনটা ঘটা সম্ভব নয়। ঘটছেও না। না ঘটার জন্য আমরা যা পাচ্ছি তার নাম যা-ই হোক না কেন, গণতন্ত্র নয়—অন্যকিছু।

(সমাপ্ত)